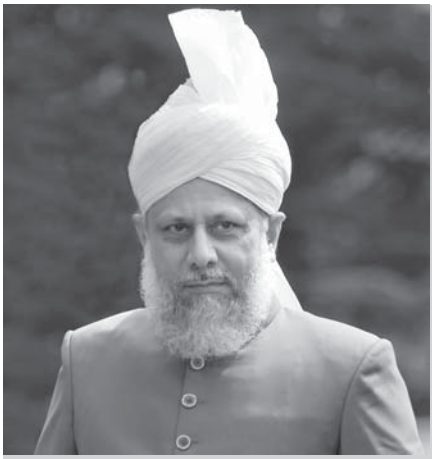

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৮ জানুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

হযরত মহাম্মদ (সা.) সকল রাসূলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই মর্যাদা দান করেছেন যার প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসরণে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করে থাকে।

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসে কুদসী: **'লাউ লাকা লামা খালাকতুল আফলাক'**-এ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না- এ ভূমি এবং আকাশ সৃষ্টি করতাম না।

মুসলমানদের একটি বড় অংশ যদিও এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় আপত্তি করে কিন্তু আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও যুগ ইমাম- এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত করেছেন। এটি সেই মর্যাদা যা আঁ হযরত (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদার দিকে ইংগিত করে। তিনি (সা.) সকল রাসূলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই মর্যাদা দান করেছেন যার প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসরণে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করে থাকে। তাঁকে (সা.) নবুওয়াতের সেই মোহর দান করা হয়েছে যা বিগত নবীগণকে মোহরাংকিত করে- সেই নবীগণের নবী হওয়াকে সত্যায়ন করে। তিনি সেই খাতামান্নাবীঈনের মর্যাদা লাভ করেছেন যার উম্মতিও নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেছে, আর তাঁর উম্মাতি এবং নিষ্ঠবান প্রেমিক হওয়াই তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকরী মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)-কে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাঁর (সা.) সাথে নৈকট্যকে খোদা তাআলা কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা করেছে **"দানা ফাতাদাল্লা"** এটি আল্লাহ্ তাআলার সাথে নৈকট্যের পরম উৎকর্ষতা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: "(এটি) আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যদায় এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, উপরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে মানব জাতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। আঁ হযরত (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য অতি উচ্চ মার্গের বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত অসম্ভব। আর এ বৈশিষ্ট্যে তাঁর দুটি পদমর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। একটি 'সউদ' (অর্থাৎ উচ্চতায় আরোহন করা) দ্বিতীয়টি 'নযূল'। আল্লাহ্ তাআলার দিকে তাঁর 'সউদ' হয়েছে অর্থাৎ খোদা তাআলার ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন যে, স্বয়ং সেই পবিত্র সত্বার 'দুনূ' এর মর্যাদা লাভ করেছেন। 'দুনূ' 'আকরাবু' থেকে ব্যপকতর (অর্থ বহন করে) এ কারণে এখানে এ শব্দ চয়ন করা হয়েছে। (অর্থাৎ 'দুনূ' 'কুরুব' এর তুলনায় ব্যাপক ও প্রসারতার অর্থ দেয়। 'কুরব' শব্দে কেবল নৈকট্যের ধারণা সৃষ্টি হয় কিন্তু 'দুনূ'-তে এতো নৈকট্যে যে, পরস্পর একই সত্ত্বায় রূপ নেয়। অত:পর তিনি (আ.) বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলার আশীষ ও কল্যাণসমূহ থেকে তিনি (সা.) অংশ লাভ করেন তখনই তিনি মানব জাতির জন্য নযূল করলেন। এটি সেই রহমত ছিল যা 'ওমা আর সালনাকা ইল্লা রাহ্মাতাল্লিল আলামীন' (সূরা আম্বিয়া:১০৮) এ উল্লেখ করা হয়েছে। (আমরা তোমাকে কেবলমাত্র রাহ্মাতাল্লিল

আলামীন করে প্রেরণ করেছি)। আঁ হযরত (সা.)-এর নাম 'কাসেম' হওয়ার এটিই গুঢ় তত্ব যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলা থেকে গ্রহণ করে সৃষ্টির মাঝে বিতরণ করেন। সুতরাং সৃষ্টির নিকট বিতরনের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, অতপর এই 'দানা ফাতাদাল্লাতে' এরূপ 'সউদ' এবং 'নযূল' এর দিকেই ইশারা করা হয়েছে। আর এটি আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার দলিল। (মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড পৃঃ ৩৫৬, রাবোয়া থেকে প্রকাশিত)।

সুতরাং তাঁর (সা.) 'নযূল' এর মাধ্যমে যে নতুন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে যাতে তিনি (সা.) আল্লাহ তাআলার নিকট সুউচ্চ নৈকট্য লাভ করে মানুষের মুক্তি, খোদা তাআলার সাথে ভালবাসা এবং আল্লাহ তাআলার সমীপে শাফায়াতের মর্যাদা লাভ করেছেন আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর (সা.) সঙ্গে ভালবাসাকে নিজের সাথে (তথা খোদার সাথে) ভালবাসা আখ্যা দিয়েছেন। এ সকল বিষয়ে প্রমাণ করে যে, এ 'আফলাক' (আকাশসমূহ) ও খোদা তাআলার বিশেষ ভালবাসার প্রেক্ষিতে তাঁর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁর (সা.) উচ্চ মর্যাদার জন্য এ হাদীসে কুদসীকে আমাদের নির্ভূল মনে না করার কোন কারণ নেই। অতএব, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভূক্তির মধ্যে দিয়েই আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদাকে জেনেছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'লাউ লাকা লামা খালাকতুল আফলাক'** এ অসুবিধা কী? কুরআন মজীদে সাধারণ মানুষের জন্য **"খালাকালাকুম মা ফিল আরদি জামিয়া"** (বাকারাঃ ৩০) অর্থাৎ, ভূমিতে যা কিছু আছে সব কিছু সাধারণ মানুষের জন্য। তাহলে কী বিশেষ মানুষের জন্য এমন হতে পারে না যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা 'আফলাক' আকাশ সমূহ? ..... (যদি পৃথিবীর সব কিছু সাধারণ মানুষের জন্য হতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজ বিশেষ মানুষের জন্য 'আফলাক' এর সৃষ্টিও করতে পারেন)। তিনি বলেন, বস্তুত পক্ষে আদমকে যে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছিল এর তাৎপর্য এটিই ছিল, তিনি এ সৃষ্টি সমূহ থেকে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ নিবেন। আর যে সকল বস্তুতে তার দখল নেই সেগুলো খোদা তাআলার নির্দেশে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে যেমনঃ সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেগুলোতে মানুষের দখল নেই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এগুলো সব মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এ জিনিসগুলো সর্বাপেক্ষা বেশি আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অতীতেও করেছে আর এখনও করে যাচ্ছে। তাঁর (সা.) যুগে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এটি একটি আলৌকিক ঘটনা ছিল। পৃথিবীবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। এটির বিস্তারিত বর্ণনা এখন উল্লেখ করবো না, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ কথাই বলেছেন, আর প্রমাণ করেছেন যে, এ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এক স্থানে এটিও বলেছেন, 'এটি হয়ত কোন্ ধরনের গ্রহণ হতে পারে যা অন্যরাও দেখেছে'। অতপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের মাহদীর জন্য যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অমুক মাসে, অমুক দিনে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে (সুনন দার কুতনী, কিতাবুল ঈদাইন)।

এটিও আফলাক (বা আকাশের) বিষয়াদী, বিশ্ব জগতের এগুলিকে আনুগত্য করার বিষয়। আর সে যুগে যখন এ গ্রহণ হয়েছিল তখন সে যুগের সংবাদপত্র সমূহও এ বিষয়ের সাক্ষী যে, এ ঘটনা ঘটেছে।

যাহোক, এ সমস্ত ভূমিকা বা বর্ণনা থেকে আমার উদ্দেশ্য হল, তাঁর (সা.) সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করা। এ ছাড়াও তাঁর (সা.) অগনিত অলৌকিক ঘটনা সমূহ আমরা রেওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে দেখতে পাই, যা দ্বারা তাঁর (সা.) মহান মর্যাদা এবং খোদা তাআলার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়, যার দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ সকল বিষয়াবলী সত্ত্বেও কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে যা তারা করেছিল, আপনি আমাদের সামনে আকাশে আরোহন করেন আর এমন কেতাব নিয়ে আসেন, যা আমরা পাঠ করবো। তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন, **"কুল সুবহানা রাব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রাসূলা"** (বনী ইসরাইলঃ ৯৪) অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার প্রভু প্রতিপালক এ সব বিষয়াদী থেকে পবিত্র, আমিতো কেবল একজন মানব রাসূল। সুতরাং তাঁর (সা.) মর্যাদা সকল মানুষের উর্ধ্বে কেননা তিনি পরিপূর্ণ মানব। কিন্তু মানব রাসূল হওয়ার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে খোদা তাআলা তাঁর সাথে সেই আচরণই করেছেন যেরূপ আচরণ তিনি অন্যান্য রাসূলদের সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ যেভাবে অন্য রাসূলদের সাথে তাদের জাতিগুলো বিরোধীতা করেছে তাঁর (সা.) সাথেও করা হয়েছে। যেহেতু তিনি সকল যুগের জন্য এবং সমস্ত জাতির জন্য এসেছিলেন তাই সে যুগেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিরোধীতা করা হয়েছিল এখনও তা অব্যাহত আছে, আর এ বিরোধীতা করা হতে থাকবে। অন্যান্য নবীদের সাথেও হাসি ঠাট্টা হয়েছিল তাই তাঁর সাথেও হাসি ঠাট্টা হয়েছে আর হচ্ছে। কিন্তু পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ পূর্বেও নবীদের গ্রহণ করেছেন। তাঁকে তাঁর (সা.) যুগে সর্বাধিক গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর জীবদ্দশায় আরবে আর আরবের বাইরে নিকট অঞ্চলগুলোতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। অতঃপর একটি বিশ্ব দেখেছে যে, ইসলাম সমস্ত পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। আর আজও বিস্তার লাভ করে চলছে। এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর অধিকাংশই ইসলাম ও আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অধীনে তবলীগ এর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা"** (সূরা মায়দাঃ ৬৮)। অর্থাৎ তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ করা হয়েছে সেটিকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও। অতএব, তিনি (সা.) সৌন্দর্য, দয়া, ভালবাসা, ক্ষমা, ধৈর্য্য এবং দোয়া দ্বারা এ পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। অথচ অন্যান্যরা তো আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এ আপত্তি দিয়ে থাকে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু কতক মুসলমান আলেম বা নামধারী মুসলমান আলেমও এ দৃষ্টি ভঙ্গি রাখে যে, ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। অথচ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত হয় অতঃপর পরবর্তী বছর যখন বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয় তারপর থেকে হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যার মধ্যে আহযাবের যুদ্ধে সর্বাধিক

৩ হাজার সংখ্যায় মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল। হুদয়াবিয়া সন্ধির সময় ১৫ শত সদস্যের কাফেলা ছিল যারা তাঁর (সা.) সাথে মক্কায় গিয়েছিলেন আর হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত এ সময়কাল প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। অথচ হুদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পৌনে দুই বৎসর সময়ে যে সৈন্যবাহিনী হুযূর (সা.)-এর সাথে মক্কা গিয়েছিল সেটির সংখ্যা ছিল ১০,০০০ (দশ হাজার)। সুতরাং এটিও একটি বড় দলিল যে, শান্তির দুই বৎসরে ইসলাম অধিক প্রসার লাভ করেছিল। এরূপে ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমে প্রচারের অনেক ঘটনা রয়েছে, ক্ষমার অনেক ঘটনা আছে, যা মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে।

আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষমা, মার্জনা, স্নেহের ব্যবহারের ঘটনা আমি বিগত খুতবা সমূহেও বর্ণনা করেছি। তিনি (সা.) এ সকল ব্যবহার কেন করেছিলেন? এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটি তোমাকে করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা বলেছেন, নি:সন্দেহে এ আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত, তথাপি নবীদের সাথে মানুষের আচরণের যে ধারা চলে আসছে তা তাঁর (সা.) সাথেও সংঘটিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন, "হে নবী! তোমার সাথেও হবে, কিন্তু তুমি ধৈর্য সংযম, সহ্য ক্ষমা, সহিষ্ণুতার মাধ্যমে তবলীগের কাজ করে যাবে। পারতপক্ষে কাঠিন্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, যদি কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক প্রকারের মন্দ, অশ্লীলতা, দুঃখ, কষ্টে ধৈর্য্যের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে থাকবে। ইসলামের শান্তি ও ভালবাসার বার্তা এভাবেই ছড়াবে। কুরআন করীমে খোদা তাআলা কিভাবে এ সকল বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন আর কিরূপ উপদেশ প্রদান করেছেন? আমি সেগুলি বর্ণনা করছি।

আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফে বলেন,

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ

অর্থাৎ, তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং স্বীয় প্রভূর গুণ কীর্ত্তনসহ, সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্তয়ের পূর্বে প্রশংসা করতে থাকো। (সূরা ক্বাফ: ৪০)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন যে, শত্রু যে কটুক্তি ও কষ্টদায়ক আচরণ করে সেটিতো হওয়ারই ছিল, তুমি ধৈর্য্যের সাথে সহ্য কর। কুরআন করীম এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূলই বিজয়ী হবেন। যার সাথে খোদা তাআলা আছেন সেই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে থাকে। এ কারনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি কুরআন করীম এবং এর শিক্ষার মাধ্যমে উপদেশ দাও ও সতর্ক করতে থাক। সুতরাং যারা খোদাকে ভয় করে তারা এ উপদেশ ও সতর্কতার কারণে ভীত হয়ে নিজের ইহকাল এবং শেষ পরিণামের সফল সম্পন্নকারী হয়ে যাবে।

অত:পর খোদা তাআলা আঁ হযরত (সা.)-কে শত্রুদের রূঢ় আচরণের প্রেক্ষিতে কি আচরণ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۭ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেরূপ দৃঢ় সংকল্পকারী রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে তাড়াহুড়া করো না। যেদিন তারা সেটিকে দেখবে যার সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তখন তাদের নিকট এমন মনে হবে, যেন তারা দিনের একটি অংশের বেশি অপেক্ষারত ছিল না। সংবাদ পৌঁছানো হয়েছে। সুতরাং দুস্কৃতিপরায়ণ ছাড়া আর কাউকেও কি ধ্বংস করা হয়ে থাকে?

(সূরা আহকাফ: ৩৬)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তাঁর (সা.) আগমনের মাধ্যমে যে নতুন ব্যবস্থাপনা জারী হবার ছিল, সেটি জারী হয়ে গেছে, সেটি খোদা তাআলার তাকদীর। তবে সফলতা লাভেরও একটি সময় রয়েছে। তাই সহ্য ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করা উচিত। হে রাসূল (সা.)! আপনি এবং আপনার মান্যকারীগণকেও এরূপ সহ্য ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করতে হবে এটিই দৃঢ় সংকল্পকারী নবীগণ এবং তাদের মান্যকারীদের পদ্ধতি। সহ্য ও ধৈর্যেই এ সকল কষ্ট এবং কাঠিন্যে সফলতার কারণ হয়ে থাকে। যখন সফলতা আসবে শত্রু ধৃত হবে, তখন সে চিন্তা করবে, আমি কি করছিলাম। তখন তার খেয়াল হবে, বৈষয়িক জীবন যাকে আমি সব কিছু মনে করছিলাম সেটিতো কেবল দিনের একটি অংশ অথবা এক ঘন্টার চেয়ে অধিক কিছুই ছিল না। অতএব নবীগণের বিরোদ্ধাচরণকারীদেরকে ধৃত করার যতটুকু সম্পর্ক আছে এ কাজ আল্লাহ্ তাআলা নিজ হস্তে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.)-এর সাথেও এ আচরণ সবচেয়ে বেশি প্রদর্শন করেছেন।

তাঁর শত্রুদেরকে এমনভাবে পর্যদুস্ত এবং পদদলীত করেছেন যে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর (সা.) বড় বড় শত্রু যাদেরকে মক্কার সর্দার মনে করা হত তারা কোথায় গেল? কোথায় গেল সে বাদশাহ যে তাঁকে ধরার জন্য সেনা পাঠিয়েছিল? তাই আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত সেজন্য খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক যুগে শত্রুদের ধৃত হওয়ার নিদর্শনও প্রদর্শিত হতে থাকবে।

আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোদ্ধবাদীগণ তাঁকে কিভাবে কষ্ট দিত, তাঁর (সা.) কী কী নাম রেখে ছিল আর কিভাবে তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বলেন,

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝

অর্থাৎ, এবং তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে নিশ্চয় তুমি পাগল।

(সূরা হিজর: ৭)

এটি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি বিদ্রুপ বরং প্রকাশ্য একটি গালি। এ সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল আর তখন কেবল কয়েকজন ইমান আনয়নকারী পবিত্রচেতা ব্যক্তি ব্যতিরেকে সেখানকার প্রায় সমস্ত জনবসতিই তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করতো। কিন্তু যখন তিনি (সা.) মক্কা বিজয় করেন তখন সকলের সাথে ভালবাসা এবং নম্রতার আচরণ প্রদর্শন করেছেন। বরং যেভাবে আমি বিগত খুতবায় বলেছি, এ

সকল লোক কেবল গালমন্দকারীই ছিল না, এসকল লোক নির্যাতনকে চরমত্ত দান করেছিল। বলপূর্বক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকের সাথে নম্র আচরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি নিজে প্রতিশোধ নিব।

অতপর আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে সূরা ফুরকানে বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۝

অর্থাৎ আর যে সকল লোক অস্বীকার করেছে তারা বলে, এটি মিথ্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, যা সে বানিয়ে নিয়েছে। আর এ ব্যাপারে অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং নিশ্চয় তারা প্রকাশ্য অত্যচারী ও মিথ্যা আরোপকারী। (ফুরকান: ৫) যদিও এ আয়াতে ব্যাপক বিষয় বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এখানে কেবল এটি বলাই উদ্দেশ্য যে, তাঁর (সা.) দাবীর পূর্বে যারা তাঁকে সত্যবাদী আখ্যা দিত আর এতে তাদের মুখ ক্লান্ত হত না, তাঁর সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততার মান্যকারী ছিল।

অত:পর হুযূর (সা.)-এর সাথে অত্যচারকারীদের কটুক্তির ব্যাপারে কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, **"ওয়া কালায্ যালিমুনা আন্ তাত্তাবিয়ু ইল্লা রাজুলান মাস্হুরা"** এ আয়াতের অর্থ হল, আর অত্যাচারীরা বলে, তোমরা এমন এক ব্যক্তির পিছনে চলছো যাকে জাদু করা হয়েছে।

(ফুরকান: ৯)

অত:পর কাফেরদের মন্দ বাক্যালাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক আয়াতে বলেন,

আর তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী আসায় তারা অবাক হলো। আর কাফিররা বললো, এ একজন যাদুকর ও বড় মিথ্যাবাদী।

(সূরা সাদ: ৫)।

সুতরাং কখনো মিথ্যাবাদী, কখনো জাদুকর বা অন্য কিছু কিংবা কখনো অন্য কোন নামে কাফেররা তাঁকে (সা.) ডাকতে থাকে। আর তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, বিভিন্নভাবে তারা তাঁর সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ধৈর্য, প্রশংসা ও দোয়ার নির্দেশ দেন, আর মু'মিনদেরকেও আল্লাহ্ তাআলা একই নির্দেশ দিয়েছেন।

অতপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

অর্থাৎ আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের পক্ষ থেকেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় তা হবে সাহসিকতার কাজ।

[আলে ইমরান:১৮৭]

অতএব এমন একজন মু'মিন ব্যক্তি যে নিজের প্রেমাস্পদ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য ভালবাসা রাখে, নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় জ্ঞান করে, তার জন্য এর চেয়ে বেশি হৃদয়বিদারক ও কষ্টকর বিষয় আর কি হতে পারে যে, সে নিজের নেতা সম্পর্কে এমন কোন বিষয় শুনবে যা তাঁর (সা.) মর্যাদায় সামান্যতম আঘাত আনতে পারে। কোন রাসূল প্রেমিকই কোন অবস্থাতেই এটি সহ্য করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এখানে বলেন, তোমরা এমন কথা শুনেও ধৈর্য ধারণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, গত খুতবায় আমি সেটির উদাহরণ দিয়েছিলাম, প্রকৃত প্রতিক্রিয়া সেটিই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু এর জন্যও তাকওয়ার শর্ত রয়েছে। তাকওয়া অবলম্বন করে নিজের আমল এবং দোয়ার মাধ্যমে যে জবাব দিবে সেটিই ঐ ভালবাসার সঠিক প্রকাশ হবে। আমরা শত্রুদের গালমন্দ শুনে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়ার সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণকারী খোদার সম্মুখে অবনত হলেই ইসলামের শত্রুদের মন্দ পরিণতি অবলোকন করতে পারব। তবে আমাদের নিজেদের তাকওয়ার শর্ত আবশ্যক। যাহোক, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (সা.) এবং কুরআনের প্রতি আপত্তিকারীদের প্রতি উত্তরে কুরআনে যা বলেছেন তা এটিই যে, এ ব্যাপারে খোদা তাআলা স্বয়ং প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের কুরআন করীমের এক জায়গায় যে উত্তর দিয়েছেন সেটি সূরা আল্ হাক্কায় (আল্লাহ্) বলেন,

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ নিশ্চয় এ (কুরআন) এক সম্মানিত রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী। আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা অল্পই ঈমান এনে থাক। আর এটি কোন গণকেরও কথা নয় তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। এটি তো বিশ্ব জগতের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(সূরা হাক্কা ৪১-৪৪)

নাউযুবিল্লাহ! ঐ সকল হাসি ঠাট্টাকারী, যারা তাঁকে (সা.) বিভিন্ন নামে সম্বোধনকারী, মিথ্যা আরোপকারী তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা এ উত্তর দিয়েছেন। সুতরাং এটি হল, তাঁর সাথে হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের এবং আপত্তিকারীদের যথাযথ উত্তর।

এগুলো সত্ত্বেও খোদা তাআলা মু'মিনগণ এবং তিনি (সা.)-কে ধৈর্য ও দোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, খোদা তাআলা নিজে শত্রুদের ছেড়ে দেননি। তিনি কেবল এ উত্তর দেন নি যে, তোমাদের আপত্তি সমূহ যা তোমরা তাঁর প্রতি আরোপ করছো সে গণক, সে মিথ্যাবাদী, তোমাদের এ আপত্তি যথার্থ নয় বরং আল্লাহ্ তাআলা যখন এটি বলেন যে, **"ইন্না কাফফাইনাকাল মুসতাহ্যিইয়ীন"** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা হাসি-ঠাট্টাকারীদের মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট।

(সূরা হিজর: ৯৬)।

আল্লাহ্ ইসলামের শত্রুদের থেকে এ পৃথিবীতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন বা মৃত্যুর পর। খোদা তাআলা বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۲﴾

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

অর্থাৎ আর যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের ঠাই হবে আগুন। তারা যখনই তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাতে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এখন তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে। আর আমরা নিশ্চয়ই (বড় আযাবের পূর্বে তাদের ছোট আযাবের) স্বাদ গ্রহণ করাবো যাতে তারা (অনুতাপের সাথে আমাদের দিকে) ফিরে আসে।

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াত সমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পরও, সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব।

(সূরা আস্ সেজদা: ২১-২৩)

সুতরাং শত্রু যদি শত্রুতা থেকে বিরত না হয়তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যিনি তাঁর স্নেহাস্পদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন তিনি শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া ব্যতিরেকে ছাড়েন না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সংশোধনের জন্য

নিজের কতক নিদর্শন প্রদর্শন করেন, শত্রুরা যদি আল্লাহ্ তাআলার সতর্কতাসমূহ থেকে উপকৃত না হয়, সেই উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না তাহলে অবশ্যই শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ ক্ষমতা আমার নিকটেই আছে।

অত:পর তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে খোদা তাআলা বলেন,

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۱﴾

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿۱۲﴾

اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿۱۳﴾

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۴﴾

অর্থাৎ আর তারা যা বলে এতে ধৈর্য ধর এবং তাদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে সরে পড়. আর তুমি আমাকে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী প্রত্যাখানকারীদের (একা) ছেড়ে দাও এবং এদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও; নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে শাস্তির অনেক উপকরণ ও জাহান্নাম, এবং গলায় আটকে যাওয়া এক খাবার আর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিও (রয়েছে)।

(মুযাম্মিল: ১১-১৪)।

সুতরাং যেখানে তাঁকে (সা.) ধৈর্যের নির্দেশ দয়া হয়েছে, সেখানে বৈষয়িক লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্য তাদেরকে অস্বীকারকারী বানিয়ে দিয়েছে এ অস্বীকারের শাস্তি তারা পাবে কেননা তারা সীমালংঘন করে যাচ্ছে। তাদের শাস্তিও এরূপ হবে যা অন্যদের জন্য লাঞ্চনার নিদর্শন হবে। আর এ লাঞ্চনার নিদর্শন বানানোর বিষয়টিও খোদা তাআলা নিজের কাছে রেখেছেন।

নবী এবং তাঁর মান্যকারীদের ধৈর্য ধারণ করার, আর অস্বীকারকারীদের বৃথা বাক্যালাপ শুনে ঝগড়া না করে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

অত:পর খোদা তাআলা স্বয়ং শাস্তি দেয়ার বর্ণনা সূরা আলাক্বে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ﴿۱۰﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿۱۱﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰۤى ﴿۱۲﴾

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿۱۳﴾

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿۱۴﴾

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۵﴾

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا

بِالنَّاصِيَةِ ﴿۱۶﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿۱۷﴾

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿۱۸﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿۱۹﴾

অর্থাৎ তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ যে বাধা দেয়, এক মহান বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? সাবধান! সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অথবা সে তাকওয়ার নির্দেশ দিলেও কি তাকে বাধা দিবে? সে ব্যক্তি যদি সত্যকে প্রত্যাখান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে (সেক্ষেত্রে) তুমি কি ভেবে দেখেছ তার পরিণতি কি হবে? আল্লাহ্ যে দেখছেন তা কি সে অনুধাবন করে না? সাবধান! সে বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তার কপালের ঝুটি ধরে টানবো। তা হলো এক মিথ্যা ও পপিষ্ঠ কপালের ঝুঁটি। এরপর সে (অর্থাৎ কাফির) তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে আনুক। এবং আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশতাদের ডেকে আনবো যারা তাকে জাহান্নাম নিক্ষেপ করবে।

(সূরা আলাক্ব: ১০-১৯)

সুতরাং এটি হল খোদা তাআলার শাস্তি দেয়ার পদ্ধতি। আজ এ বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, সেই মহান ব্যক্তির অনুসরণে যে সকল মানুষ নামায পড়ে, আর যারা তাদেরকে নামায পড়তে বাঁধা দেয়, তারা কারা? সুতরাং এটি তাদের জন্যও অত্যন্ত ভয়ের বিষয়, যারা কাউকে ইবাদত করতে বাঁধা দেয়।

আল্লাহ্ তাআলা যখন তার প্রিয় নবীর জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টাকারী আর অস্বীকারে অগ্রসরমান এবং কষ্টদানকারীদের অভিসম্পাত দিতে গিয়ে বলেন,

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۷﴾

এটি সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াত (তিনি আল্লাহ্) বলেন, যারা ইহুদী হয়েছে তাদের এক শ্রেণী আল্লাহ্র বাণীকে যথাস্থান থেকে বিচ্যুত করে। আর তারা বলে, আমরা

শুনলাম ও অমান্য করলাম। আর তারা আরো বলে, তুমি আমাদের কথাই শুন, অন্য কারো কথা যেন তোমাকে শুনানো না হয়।

আর তারা তাদের জিহ্বাকে মোচড় দিয়ে এবং ধর্মে খোঁচা দিয়ে 'রায়েনা' বলে। আর তারা যদি বলতো, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং আরো বলতো তুমি শুন এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য উত্তম ও অধিক সঙ্গত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অস্বীকারের দরুন তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

(নিসা: ৪৭)

সুতরাং যারা রাসূল (সা.)-এর অবমাননার রাস্তা অবলম্বন করবে তারা এ অভিশম্পাতে পতিত হবে। অত:পর ইহুদীদের এ কথা বলা আমরা এ রাসূলের সাথে এতো কিছু করছি অর্থাৎ যে কষ্ট তাকে দেয়া সম্ভব, যে গালমন্দ করা সম্ভব তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র সম্ভব সব করছি, এ রাসূল যদি সত্য হত তাহলে আল্লাহ্ তাআলা কেন আমাদের শাস্তি দেন না? আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

অর্থাৎ তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? কিন্তু তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা এরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। আর তারা পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা করার ব্যাপারে পরস্পর গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ্ তোমার ওপর সালাম পাঠান নি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ্ আমাদের কেন আযাব দেন না? তাদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তারা এতে প্রবেশ করবে। আর তা কতই মন্দ বাসস্থান।

(মুজাদেলা:৯)

কতক হাদীস থেকেও প্রমাণিত, এ ইহুদীগণ অনেক সময় এমনিই আঁ হযরত (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করত অথবা তাঁর মজলিসে আগমন করতো তখন তারা 'আসসালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে 'আসসামু আলাইকা' বলে, নাউযুবিল্লাহ্! তাঁর মৃত্যুর আকাংখা করতো। আমি যেভাবে বিগত খুতবা সমূহেও হাদীস বর্ণনা করেছি, এতে কতক সময় সাহাবারা বলতেন, আমরা একে হত্যা করবো। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে বাধা দিতেন।

(বুখারী, কিতাব ইসতাত্‌বাতুল মুরতাদ্‌দীনা ওয়াল মুয়ানেদীন, হাদীস নং ৬৯২৬)।

এ কারণে যে, তাদের এই বৃথা কার্যকলাপের (শাস্তির) বিষয় খোদা তাআলা স্বয়ং নিজের হস্তে রেখেছেন। খোদা তাআলা তাদেরকে জাহান্নামে নিপতিত করে যে শাস্তি দিবেন তা এ দুনিয়াবী শাস্তির ন্যায় হতে পারে না। তাই যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি, তিনি (সা.) খোদা তাআলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র, কিয়ামত অবধি তাঁর নবুওয়াতের ধারা প্রবাহমান, তিনি সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য সকল রাসূলগণের ন্যায় তাকেও ধর্মের শত্রুদের বিরোধীতা এবং প্রত্যেক ধরনের ক্ষতির পরিকল্পনার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রত্যেক বার আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কথা বলেছেন, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবীগণের ন্যায় ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ কর। তাঁর অনুসারীদেরকেও এরূপ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন, ধর্মের শত্রুদের হাসি ঠাট্টা, নিরর্থক কথাবার্তা, আর মন্দকর্মের প্রতিশোধ আমি কিভাবে গ্রহণ করবো, তাদের মধ্য থেকে কতককে এ পৃথিবীতে এবং কতককে মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে। তবে যদি শত্রু যুদ্ধ করে আর জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে তবে তাদের মোকাবেলার অনুমতি আছে।

কেননা যদি এ মোকাবেলার অনুমতি না দেয়া হয় তবে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীরা প্রত্যেক ধর্মের অনুসরণকারীদের সুখ শান্তিকে বিনষ্ট করে দিবে।

খোদা তাআলা এ পৃথিবীতে কিভাবে তাঁর (সা.) অবমাননাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন সেটিরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটি প্রতিশোধের ঘোষণা কুরআন করীম এভাবে উল্লেখ করেছে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়াতাব' অর্থাৎ আবু লাহাবের দুটো হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধংস হোক।

(সূরা লাহাব: ২)

তিনি (সা.) যখন নবুওয়াতের দাবী করলেন আর নিজের আত্মীয় স্বজনদের তবলীগের জন্য একত্রিত করলেন তখন এ ব্যক্তি (আবু লাহাব) যিনি তাঁর (সা.) চাচা ছিলেন, তাঁর (সা.) সর্ম্পকে নিতান্তই অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছিল।

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাব সূরা তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ, হাদীস নং ৪৯৭১)।

দেখ! তখন সত্য প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সর্বশক্তিমান খোদা তাকে কিভাবে ধৃত করেছিলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, একদা এক সফরে নেকড়ের দল তাকে আক্রমণ করে বসে আর তাকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলে।

অতএব তিনি (সা.), যাকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত প্রেমাস্পদ ও শ্রেষ্ঠতর করে রেখেছেন, তাঁর সঙ্গে খোদা তাআলার কৃত প্রতিশ্রুতিসমূহও সর্বদা পূর্ণ হতে থাকবে। প্রত্যেক যুগেই ইসলামের শত্রুরা নিজেদের পরিণাম ভোগ করবে এবং করতে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা আমাদেরকে তাঁর (সা.) সুউচ্চ মর্যাদার দৃশ্য দেখাতে থাকুন এবং তার সাথে খোদা তাআলার ভালবাসার আচরণ প্রদর্শন করতে থাকুন।

আমরা যেন প্রকৃত অর্থে কুরআনের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্ত-বায়নকারী এবং আঁ হযরত (সা.) স্বীয় উম্মতের কাছে যেরূপ প্রত্যাশা করেছেন ঠিক সেরূপ মু'মিন হওয়ার চেষ্টা করি।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্